بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ১৩ ফাতাহ্, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনীর বরাতে একটি সারিয়্যা বা সামরিক অভিযানের বিবরণ দেবো যাকে কুরতা-র যুদ্ধাভিযান বলা হয়। এই যুদ্ধাভিযান হিজরী ৬ সনের দশই মুহাররম সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে ত্রিশজন অশ্বারোহী সাহাবীসহ কুরতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। কুরতা বনু বকর বিন কিলাবের একটি শাখা গোত্র ছিল যারা যারিয়ার নিকটবর্তী বাকরাত নামক স্থানে বসবাস করত। বাকরাত মদীনা থেকে সাত রাতের দূরত্বে অবস্থিত। যারিয়া বনু কিলাবের একটি প্রাচীন গ্রাম ছিল। প্রাচীন রেওয়ায়েতে যা পাওয়া যায় তদনুযায়ী এটিও মদীনা থেকে সাত রাতের দূরত্বে অবস্থিত। এখন তো সেই দূরত্ব অনেকটা কমে গিয়ে থাকবে। একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, যারিয়া মদীনা থেকে এক বা দুই রাতের দূরত্বে অবস্থিত। উক্ত ত্রিশজন সাহাবীর মধ্যে হযরত আব্বাদ বিন বিশর, হযরত সালামা বিন সালামা এবং হযরত হারেস বিন খাযমা (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) এই সৈন্যদলকে রাতের বেলায় সফর করতে ও দিনের বেলায় আত্মগোপনে থাকার এবং শত্রুর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। যখন তারা শারাবা নামক স্থানে ছিলেন; (শারাবা নাজদ-এর ভেতরেই একটি স্থান ছিল;) তখন তারা কতক অশ্বারোহীকে দেখতে পান। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাদের একজন সঙ্গীকে প্রেরণ করেন যেন তিনি তাদের কাছ থেকে জানতে পারেন, তারা কারা? অতঃপর তিনি যান এবং ফিরে এসে বলেন, তারা মুহারেব গোত্রের লোক। তারা কাছেই কোনো একটি স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়েছে আর নিজেদের পশুগুলোকে চরানোর জন্য ছেড়ে রেখেছে। মুসলমানরা তাদেরকে এতটা সুযোগ প্রদান করে যে, তাদের পশুগুলো পানির কাছে এসে বসে পড়ে। এরপর মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে কতককে হত্যা করে আর বাকিরা পালিয়ে যায়। যারা পলায়ন করেছে তাদের আর পিছু ধাওয়া করা হয় নি। সাহাবীরা উট আর ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান আর নারীদেরকে ছেড়ে দেন। অতঃপর সেখান থেকে যাত্রা করেন। এরপর তারা এমন একটি স্থানে পৌঁছেন যেখান থেকে তাদের জন্য বনু বকরের ওপর নজর রাখা সম্ভব। তখন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) হযরত আয়েয বিন বুসরকে বনু বকর সম্পর্কে খবরাখবর অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আয়েয ফিরে এসে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা নিজ সঙ্গীদের নিয়ে বের হন আর বনু বকরের ওপর আক্রমণ করেন। তাদের দশজন লোককে তিনি হত্যা করেন আর উট ও ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে আনেন এবং মদীনার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা নিজেদের কতক সঙ্গীকে ছাগপালের সাথে পেছনে ছেড়ে আসেন আর উটগুলোকে হাঁকিয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট মদীনায় পৌঁছে যান, পরবর্তীতে ছাগলগুলোও পৌঁছে যায়। মহানবী (সা.) সেগুলো থেকে 'খুমুস' আলাদা করেন আর অবশিষ্ট (যুদ্ধলব্ধ

সম্পদ) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার সাথিদের মাঝে বণ্টন করে দেন। একটি উটকে দশটি ছাগলের সমান ধরা হয়েছিল। এই ঘটনা ঐতিহাসিক কোনো এক গ্রন্থে লিখিত রয়েছে। যেহেতু এখানে বিশদ বিবরণ নেই তাই (বাহ্যত) মনে হয়, অনেক বড়ো অন্যায় হয়েছে। পরবর্তীতে এর ব্যাখ্যাও বর্ণিত হবে।

সর্বমোট দেড়শত উট এবং তিন হাজার ছাগল ছিল। উক্ত যুদ্ধাভিযানের জন্য হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা ঊনিশ রাত মদীনার বাইরে ছিলেন। আর হিজরী ৬ষ্ঠ সনের ঊনত্রিশে মুহাররম মদীনায় ফিরে আসেন।

এর বিস্তারিত বর্ণনায় বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ইতিহাস থেকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা লিখেছেন তা হলো, ষষ্ঠ হিজরী সন মাত্র আরম্ভ হয়েছিল আর চান্দ্র পঞ্জিকার প্রথম মাস অর্থাৎ মুহাররমের প্রাথমিক দিনগুলো ছিল যখন মহানবী (সা.) নাজদবাসীদের পক্ষ থেকে বিপদের সংবাদ পান। এই আশঙ্কা কুরতা গোত্রের পক্ষ থেকে ছিল যারা বনু বকর গোত্রের একটি শাখা ছিল আর নাজদ অঞ্চলের যারিয়া নামক স্থানে বসবাসরত ছিল, যা মদীনা থেকে সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এই সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ ত্রিশজন অশ্বারোহীর ছোট্ট একটি দল নিজের একজন সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারীর নেতৃত্বে নাজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদের হৃদয়ে এমন ত্রাস সঞ্চার করেন যে, তারা সামান্য মোকাবিলার পরই পলায়নপর হয়। আর যদিও তৎকালীন যুদ্ধরীতি অনুযায়ী মুসলমানদের কাছে এই সুযোগ ছিল যে, তারা শত্রুদের নারী ও শিশুদের বন্দি করতে পারতো, কেননা শত্রুরা তাদেরকে ফেলে পালিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদ বিন মাসলামা নারী ও শিশুদের কিছুই করেন নি আর সাধারণ গনিমতের সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন যা ছিল মূলত উট ও ছাগল।

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, তারা শত্রু জাতি ছিল; তারা মদীনায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল আর তা প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের প্রেরণ করেছিলেন। আর সেখানেও তারা এই নম্রতা প্রদর্শন করেছেন যে, নারী ও শিশুদের কিছুই করা হয় নি।

এই ঘটনায় সুমামা বিন উসাল-এর বন্দি হওয়া এবং ইসলাম গ্রহণ করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরতা যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে আসার পথে সুমামা বিন উসাল-এর বন্দি হওয়ার ঘটনা ঘটে। এর বিস্তারিত বিবরণে সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে লেখা আছে:

এই অভিযান অর্থাৎ কুরতা যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে আসার পথে সুমামা বিন উসাল-এর বন্ধি হওয়ার ঘটনা ঘটে। এই ব্যক্তি ইয়ামামার অধিবাসী ছিল এবং বনু হানীফা গোত্রের একজন অতি প্রভাবশালী নেতা ছিল। সে ইসলামের প্রতি শত্রুতায় এতটা অগ্রসর ছিল যে, সর্বদা নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে থাকত। যেমন, একবার মহানবী (সা.)-এর একজন দূত তার এলাকায় গেলে সে সমস্ত যুদ্ধনীতিকে উপেক্ষা করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। বরং একবার সে স্বয়ং মহানবী (সা.)-কেও হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামার দল যখন সুমামাকে বন্দি করে আনে তখন তারা জানতেন না, এই ব্যক্তি কে। বরং তারা তাকে কেবল সন্দেহের বশে বন্দি করেছিলেন। আর মনে হয় যেন সুমামা-ও একান্ত চতুরতার সাথে তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ পেতে দেয় নি। কেননা সে জানতো, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সব অপরাধ করেছি; যদি ইসলামের এই আত্মাভিমানী সৈনিকরা এটি জানতে পারে, আমি কে– তাহলে হয়ত তারা আমার সাথে কঠোরতা করবে অথবা হত্যাই করে ফেলবে। কেননা সে স্বয়ং বহু এমন কাজ করেছিল যেন

মুসলমানদের ক্ষতি হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে সে উত্তম ব্যবহার আশা করছিল। তার ধারণা ছিল, মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে গেলে সেখানে আমার সাথে উত্তম ব্যবহার করা হবে। অতএব মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন মাসলামার দলের কাছে সুমামার পরিচয় অপ্রকাশিত ছিল।

মদীনায় পৌঁছে যখন সুমামাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি তাকে দেখেই চিনতে পারেন। আর মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সঙ্গীদের বলেন, তোমরা কি জানো, এই ব্যক্তি কে? তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তখন মহানবী (সা.) তাদের কাছে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। এরপর তিনি (সা.) অভ্যাস অনুযায়ী সুমামার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেন এবং এরপর ঘরের ভেতরে গিয়ে বলেন, খাবারের জন্য যা কিছুই প্রস্তুত আছে তা সুমামার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দাও। একই সাথে তিনি (সা.) সাহাবীদের এই নির্দেশও দেন, সুমামাকে কোনো ভিন্ন বাড়িতে রাখার পরিবর্তে মসজিদে নববীর আঙিনাতেই যেন বন্দি হিসেবে কোনো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। তাঁর (সা.) উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর (সা.) বৈঠক এবং মুসলমানদের নামায ইত্যাদি যেন সুমামার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আর তার হৃদয় এসব আধ্যাত্মিক দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এভাবে তাকে বাঁধা হয়েছিল; তাকে এমন ভাবে বাঁধা হয় নি যার ফলে সে প্রভাবিত না হয়ে রাগান্বিত হতো। বরং কোমলতার সাথে এবং আলতোভাবে বাঁধা হয়ে থাকবে, যেভাবে একজন বন্দিকে বাঁধা হয় যেন সে হাত-পা নাড়াতে পারে।

সে দিনগুলোতে প্রতিদিন সকালবেলা মহানবী (সা.) সুমামার কাছে যেতেন। তার খোঁজ-খবর নেবার পর জানতে চাইতেন, সুমামা বলো, এখন তোমার পরিকল্পনা কী? সুমামা উত্তর দিত, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি আমাকে হত্যা করতে চাইলে সেই অধিকার আপনার আছে, কেননা আমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহলে আপনি আমাকে কৃতজ্ঞ পাবেন। আর যদি আপনি ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করতে চান তাহলে আমি ফিদিয়া দিতেও প্রস্তুত আছি। তিন দিন পর্যন্ত একই প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। অবশেষে তৃতীয় দিন মহানবী (সা.) স্বয়ং সাহাবীদের বলেন, সুমামার বাঁধন মুক্ত করে দাও। সাহাবীরা সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেন আর সুমামা ত্বরিৎ মসজিদ থেকে বাইরে চলে যায়। সাহাবীরা ভেবেছিলেন, সে হয়ত স্বদেশের উদ্দেশ্যে ফেরত চলে যাবে। কিন্তু মহানবী (সা.) অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, সুমামার হৃদয় এখন ইসলামের বশীভূত; এখন তার ওপর মহানবী (সা.) পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব পড়েছে, আর ফলাফলও এটিই প্রকাশ পেয়েছে। এরপর লিখেছেন, সে নিকটস্থ একটি বাগানে যায় এবং সেখান থেকে গোসল ইত্যাদি করে ফিরে আসে আর এসেই মহানবী (সা.)-এর হাতে (বয়আত করে) মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একটা সময় এমন ছিল যখন সমগ্র পৃথিবীতে আপনি, আপনার ধর্ম, এবং আপনার শহরের প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি শত্রুতা ছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে আপনি, আপনার ধর্ম এবং আপনার শহর সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

সেদিন অপরাহ্নে যখন নিয়মমাফিক সুমামার জন্য খাবার আসে তখন তিনি অল্প একটু খাবার খেয়ে রেখে দেন। এতে সাহাবীরা খুবই অবাক হন (আর বলতে থাকেন,) আজ পর্যন্ত তো সুমামা অনেক বেশি খাবার খেতো। তাকে আটকে রাখা ছিল, বাঁধা ছিল। এথেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, তাকে এমনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল যে, সে পানাহার করতে পারতো এবং খাবারের দিক দিয়ে তার যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করা হতো। যাহোক, সে স্বল্প আহার করে কিন্তু

পূর্বে অনেক বেশি খেতো, পেটুক ছিল। একথা মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন, (আজ) সকাল পর্যন্ত সুমামা কাফিরদের মতো আহার করতো কিন্তু এখন সে একজন মুসলমানের মতো আহার করেছে। আর তিনি (সা.) এভাবে এর ব্যাখ্যা করেন যে, কাফির সাত অন্ত্র পূর্ণ করে খায়, কিন্তু মুসলমানরা শুধু এক অন্ত্রভরে খায়। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যেখানে এক কাফির পার্থিব সুখ-সম্ভোগে মত্ত থাকে, যেন তাতেই নিমজ্জিত থাকে, সেখানে একজন সত্যিকার মুসলমান জীবিত থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন নিজের দৈহিক চাহিদাকে কেবল তাতেই সীমিত রাখে। কেননা সে সত্যিকার আনন্দ কেবল ধর্মের মাঝেই লাভ করে। এটিও স্মরণ রাখা উচিত, সাত বলতে এখানে অঙ্কের সংখ্যা বোঝানো হয় নি, বরং আরবী বাগধারায় সাত সংখ্যাটি আধিক্য এবং পূর্ণতার অর্থ প্রকাশের জন্যও ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো, কাফির জাগতিক ভোগবিলাসে মত্ত থাকে আর তার পূর্ণ মনোযোগ পার্থিবতার পেছনে ব্যয় হয়, কিন্তু একজন মুমিন নিজেকে জাগতিক ভোগবিলাস থেকে নিবৃত্ত রাখে এবং সত্যিকার চাহিদার পরিধি লঙ্ঘন করে না, কেননা তার প্রকৃত সুখ ও আনন্দের জগৎ ভিন্ন। এই শিক্ষাটি মহানবী (সা.)-এর স্বভাবজ আকর্ষণ এবং তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের এক প্রকৃষ্ট দর্পণ।

মুসলমান হবার পর সুমামা মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার লোকেরা যখন আমাকে বন্দি করেছিলেন তখন আমি উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। এখন আমার জন্য আপনার নির্দেশ কী? তিনি (সা.) তাকে অনুমতি দেন এবং দোয়া করেন আর সুমামা মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে সুমামা (রা.) ঈমানের উদ্দীপনায় কুরাইশের মাঝে প্রকাশ্যে তবলীগ করতে আরম্ভ করেন। (বিরোধিতা ঈমানী উদ্দীপনায় রূপ নেয়।) এই দৃশ্য দেখে কুরাইশের চোখ রক্তিম হয়ে যায় আর তারা সুমামাকে আটক করে তাকে হত্যা করার সংকল্প করে। কিন্তু একথা চিন্তা করে যে, সে ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা, আর ইয়ামামার সাথে মক্কার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে; তাই তারা এই পরিকল্পনা থেকে বিরত হয় আর সুমামাকে গালমন্দ করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সুমামার প্রকৃতিতে তখন (ঈমানের) গভীর উদ্দীপনা বিরাজ করছিল আর কুরাইশের সেসব অত্যাচার-নিপীড়ন যা তারা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর করত তা সবই সুমামার চোখের সামনে ভাসছিল। (তাই) তিনি মক্কা থেকে বিদায় নেবার সময় কুরাইশকে বলেন, খোদার কসম! মহানবী (সা.) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আগামীতে তোমরা ইয়ামামার অঞ্চল থেকে একটি শস্যদানাও পাবে না।

স্বদেশে ফিরে সুমামা সত্যি সত্যিই ইয়ামামা অঞ্চল থেকে মক্কাগামী সকল (বাণিজ্যিক) কাফেলার যাতায়াত বন্ধ করে দেন। আর যেহেতু মক্কার খাদ্যশস্যের একটি বৃহৎ অংশ ইয়ামামা থেকে আসত তাই এই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মক্কার কুরাইশ কঠিন বিপদে পড়ে যায়। স্বল্পকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই তারা বিচলিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পত্র লেখে যে, আপনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেন আর আমরা আপনার আত্মীয়-স্বজন; আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তখন মক্কার কুরাইশ এতটাই বিচলিত ছিল যে, তারা কেবল পত্র লিখেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তাদের নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবকেও মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করে। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে মৌখিকভাবেও অনেক অনুনয়-বিনয় ও হাহুতাশ করে এবং নিজেদের বিপদের বিবরণ দিয়ে দয়া ভিক্ষা চায়। তখন মহানবী (সা.) সুমামা বিন উসাল (রা.)-কে নির্দেশনা প্রেরণ করেন, কুরাইশের যেসব কাফেলার কাছে মক্কাবাসীদের খাদ্যসামগ্রী থাকবে

সেগুলোকে যেন আটকে রাখা না হয়। ফলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ধারা পুনরায় বহাল হয় এবং মক্কাবাসীরা এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পায়। এই ঘটনা একদিকে যেমন মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় দয়া, অনুগ্রহ ও মার্জনার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ, তেমনিভাবে (এটি) একথাও প্রমাণ করে যে, প্রথমদিকে মহানবী (সা.) কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাধা দেবার যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তা কুরাইশকে দুর্ভিক্ষে নিপতিত করে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কুরাইশের (আক্রমণের) আশঙ্কা থেকে নিরাপদ রাখা। এ ঘটনা থেকে এটিও সাব্যস্ত হয় যে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এটি পছন্দনীয় নয় যে, যুদ্ধরত শত্রুর সাথেও সাকুল্য যোগাযোগ বা পত্র ইত্যাদি বিনিময় এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে যার ফলে তারা (মৌলিক) খাদ্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে বা অন্ন-পানীয় থেকে বঞ্চিত হবে, আহার্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। তবে যুদ্ধাস্ত্র আমদানি-রপ্তানি বা পানাহারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত অন্যান্য পণ্য আমদানি-রপ্তানির ধারা সামরিক প্রয়োজনে রুখে দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আধুনিক বিশ্ব অদ্ভুত খেল খেলছে। যুদ্ধের সময় দরিদ্র ও অসহায় বেসামরিক লোকদের কাছে এ অজুহাতে খাবারও পৌঁছতে দিচ্ছে না যে, সেখানে সন্ত্রাসীরা রয়েছে, অমুক বা তমুক ছিল। যাহোক, এটি হচ্ছে জগতপূজারীদের কাজ, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা এমনটি নয়। পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, শত্রুপক্ষ মুসলমানদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তাহলে কুরআনের মৌলিক নীতি হলো جَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا (সূরা শূরা: ৪১) এই নিয়মের অধীনে (শত্রুপক্ষের খাদ্য) সরবরাহ বন্ধ করাও বৈধ হবে, কেননা এটি হবে পাল্টা প্রতিশোধ। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, সুমামা বিন উসাল নিজ এলাকার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তার তবলীগের কল্যাণে ইয়ামামার বহু মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র খিলাফতের সূচনাকালে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবের অনুসরণে যখন ইয়ামামার বহু মরুবাসী ইসলামধর্ম ত্যাগ করে, তখন সুমামা কেবল নিজেই যে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা-ই নয়, বরং তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু লোককে মুসায়লামার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত রেখেছেন এবং মুসায়লামার নৈরাজ্য নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ হলো এই যুদ্ধাভিযানের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা।

আজ কয়েকজনের জানাযার নামাযও পড়াবো। একটি হাযের জানাযা রয়েছে, [হুযূর (আই.) এপর্যায়ে, জানাযা এসেছে কি-না তা জানতে চান।] হাযের জানাযা মুকাররম আব্দুল লতিফ খান সাহেবের যিনি মিডলসেক্সের রিজিওনাল আমীরও ছিলেন। গত ১১ ডিসেম্বর তিনি ৮৫ (পঁচাশি) বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুহাম্মদ জহুর খান সাহেব পাটিয়ালভী (রা.)-র পুত্র এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-র (ব্যক্তিগত) চিকিৎসক হযরত হাশমতুল্লাহ্ খান সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। আব্দুল লতিফ খান সাহেব ছিলেন যুক্তরাজ্য জামা'তের প্রারম্ভিক সদস্যদের একজন। তিনি ৫৫ বছর স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন। হাউন্সলো জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে সেক্রেটারি ওসিয়্যত, সেক্রেটারি তবলীগ, সেক্রেটারি রিশতানাতা এবং রিজিওনাল আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মরহুম নামায ও রোযায় নিয়মিত ছিলেন এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন সহমর্মী, মিশুক, মিষ্টভাষী, কঠোর পরিশ্রমী,

অনুগত, পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। খিলাফতের সাথেও খুব গভীর সুসম্পর্ক ছিল। জামা'তের সেবার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। নিজ অঞ্চলে নির্মিত সমস্ত মসজিদের জন্য অনুদান সংগ্রহে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবলীগের প্রতি ভীষণ আগ্রহ রাখতেন। হাউন্সলোয় হিন্দু ও শিখদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল এবং সর্বদা জামা'তের প্রোগ্রামগুলোতে অনেক অতিথি নিয়ে আসতেন। মরহুম মূসী ছিলেন। মরহুম তার অবর্তমানে দুই মেয়ে ও চার ছেলে রেখে গেছেন। তারাও (অর্থাৎ ছেলেরা) জামা'তের কাজ করছেন। এছাড়া কয়েকজন দৌহিত্র ও দৌহিত্রী, নানি-নাতনী আছে। এককথায় তার বংশধারা বেশ বিস্তৃত। আল্লাহ্ মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানাদি ও বংশধরদের বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মনজুর আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ তৈয়্যব আহমদ সাহেবের গায়েবানা জানাযা যিনি রাজেনপুর অধিবাসী; বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডিতে বসবাস করছিলেন। তৈয়ব আহমদ সাহেবকে রাওয়ালপিন্ডিতে গত ৫ ডিসেম্বর এক আহমদী বিদ্বেষী কুঠারাঘাতে শহীদ করে দেয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। বিস্তারিত তথ্য অনুযায়ী, শহীদ তৈয়্যব আহমদ কিছুদিন পূর্বে রাজেনপুর থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে তার ভাই তাহের আহমদ কামারকে ব্যবসায়িক কাজে সহায়তা করতে এসেছিলেন। শহীদ মরহুম ভাইয়ের দোকানে বসে ছিলেন, এমন সময় এক আগন্তুক সেখানে এসে শহীদ মরহুমের সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়ে দেয়। শহীদ মরহুম উল্লিখিত ব্যক্তিকে বলেন, আপনি আমার সাথে কেন ঝগড়া করছেন? আমি তো এখানে অতিথি হয়ে এসেছি। তা সত্ত্বেও আক্রমণকারী কোনো ভ্রুক্ষেপ করে নি। মাথায়, ঘাড়ে এবং পিঠে কুড়াল দিয়ে কোপাতে থাকে। ফলে তৈয়্যব আহমদ সাহেব ঘটনাস্থলে শহীদ হয়ে যান।

শহীদ মরহুমের ভাই তাহের আহমদ কামার সাহেব যিনি ঘটনাস্থল হতে একটু দূরে ছিলেন, ভাইয়ের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে ঘাতক তার দিকেও কুড়াল নিয়ে (আঘাত করতে) এগিয়ে আসে। যাহোক, তিনি অনেক কষ্টে নিজ প্রাণ রক্ষা করেন। এ ঘটনার সময় হত্যাকারী জামা'তবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল। সে বলছিল, 'কাদিয়ানীরা! তোমাদের বার বার বলেছি তোমরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাও'। যাহোক, আক্রমণ শেষে ঘাতক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ ঘাতককে গ্রেফতার করে। দেখা যাক, মামলার ফলাফল কী হয়!

শহীদ মরহুমের ভাই তাহের আহমদ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ব্যাবসার উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডিতে বসবাস করেন। তিনি জানান, গত এক বছর যাবৎ বিরোধিতা ও হুমকিধমকির কারণে এই পরিবারকে চার বার ব্যাবসার স্থান পরিবর্তন করতে হয়। তিন মাস পূর্বে ভাড়া বাসা থেকেও বের করে দেওয়া হয়। বিরোধীরা বারবার (দোকানে) পাথর নিক্ষেপ করে আর তাদের ব্যবসায়িক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ভিত্তিহীন অপবাদ দিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তাদেরকে কয়েকবার (থানায়) তলব করে। এই সকল পরিস্থিতি তারা অতি সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেন।

শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াত আসে তার প্রপিতামহ কাদিয়ান নিবাসী উমর দীন সাহেবের মাধ্যমে। শহীদ মরহুমের দাদা আহমদ দীন সাহেবের মিস্ত্রি হিসেবে মিনারাতুল মসীহর নির্মাণে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। ফুরকান ব্যাটিলিয়ান-এও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে হিজরতের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী

(রা.)-র কাফেলায় অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানে আসার পর তিনি রহীম ইয়ার খানের 'কান্ধারা সিং'-এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। সেখানে 'আহমদীয়া বায়তুয যিকর' নির্মাণে বিশেষ অবদান রাখেন।

শহীদ মরহুম অসুস্থতার কারণে লেখাপড়া করতে পারেন নাই। তবে তিনি কিছুটা লিখতে ও পড়তে পারতেন। সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। চাষাবাদ ও কায়িক শ্রম ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। শহীদ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়মিত ছিলেন। পরিবারের সবাইকে নামাযের জন্য উপদেশ দিতে থাকতেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিলো। পিতামাতার অনেক সেবা করতেন। আত্মীয়দের প্রতি সহমর্মিতার গুণ ছিল তার মাঝে লক্ষ্যণীয়। জুমার নামাযের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। প্রথম সময়ে মসজিদে পৌছে যেতেন। শহীদ মরহুমের পিতা মঞ্জুর আহমদ সাহেব বলেন, যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একবার এশার নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েন। শহীদ মরহুম স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাকে কঠোরতার সাথে উঠিয়ে বলে, নামায কেন পড়ো নাই? তিনি বলেন, শহীদ মরহুম এরপর কখনও কোনো নামায পড়েন নি বলে মনে হয় না, বরং তাহাজ্জুদের নামাযেও নিয়মিত ছিলেন।

মরহুমের সহধর্মিণী গাযালা সাহেবা বলেন, পাঁচ-ছয় বছর পূর্বে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে আমাকে নামাযের বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বলতেন, নিয়মিত নামায আদায় কোরো।

জেলা মুরব্বী মাহমুদ আহমদ রিন্দ সাহেব বলেন, শহীদ মরহুমের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতে তিনি বলেন, জামা'তের সেবার জন্য আমি সদা প্রস্তুত আছি। আমার প্রয়োজন হলে আমাকে অবশ্যই বলবেন। শহীদ মরহুম ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক ভালোবাসতেন। তিনি সাদা মনের ও স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। মসজিদে প্রবেশের পর সুন্নত নামায আদায় করে যিকরে ইলাহীতে মগ্ন থাকতেন। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতা (মনজুর আহমদ সাহেব), মাতা মাকসুদা বিবি সাহেবা, সহধর্মিণী গাযালা সাহেবা এবং দুই ভাই রয়েছেন। তার এক ভাই মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। মরহুমের কোনো সন্তান ছিল না। একইভাবে মরহুমের দুই বোনও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দান করুন।

দ্বিতীয় গায়েবানা জানাযা ফিলিস্তিনের গাজার স্নেহের মুহান্নাদ মুআইয়্যেদ আবু আওয়াদের। তিনিও একটি ড্রোন হামলায় বিশ বছর বয়সে শহীদ হয়েছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। কাবাবীর জামা'তের আমীর শরীফ আওদা সাহেব লেখেন, মুহান্নাদ মুআইয়্যেদ আবু আওয়াদ বিশ বছর বয়সী লাজুক প্রকৃতির, স্বল্পভাষী, যুদ্ধাবস্থা সত্ত্বেও সর্বদা উত্তম বেশভূষাধারী, ইতিবাচক মনোবৃত্তির এক যুবক ছিলেন। তিনি নিজ পিতা-মাতার সাথে গাজার দক্ষিণে খান ইউনুস-এর নিকটে হিউম্যানিটি ফার্স্টের ক্যাম্পের একটি তাঁবুতে থাকতেন। হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে কাজও করতেন, লোকদের সেবাও করতেন। শুধু নিজেই ক্যাম্পে থাকতেন না, বরং হিউম্যানিটি ফার্স্টের সদস্যরা বলে, সে আমাদের একজন ভালো কর্মী ছিল। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতা মুআইয়্যেদ সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি সম্ভবত ২০০৯-২০১০ সালে নিজের পরিবারসহ বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, মরহুম মুহান্নাদ হিউম্যানিটি ফার্স্টের টিমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে

কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। খুবই উদ্যমী কর্মী ছিলেন। মুহান্নাদ নিজ পরিবারের কষ্ট ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন এবং সেগুলো নিরসনে সচেষ্ট থাকতেন। খাবারের জন্য সে এলাকায় কিছু ছিল না। এজন্য সেখানে কোথাও থেকে এক গ্রাস খাবার পাওয়া স্বর্গীয় আশির্বাদের চেয়ে কম ছিল না। বর্তমানে সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। ইসরাঈল সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্যভর্তি ট্রাকের গাজায় প্রবেশের বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সাহায্যের জন্য যেসব ট্রাক যায় সেগুলো আটকে দেওয়া হয়। শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে মুহান্নাদ গাজার দক্ষিণে রাফা এলাকায় খাবারের খোঁজে যায়। সেই এলাকায় খাদ্যসাহায্য-বোঝাই ট্রাক পার হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় হামলা করে সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয় অথবা লুট করা হয়। এজন্য কিছু যুবক সেই এলাকায় যায়, যদি ধ্বংসস্তুপ থেকে কোনো খাবারের সন্ধান পাওয়া যায়। কখনো কখনো সেখানে মাটিতে মিশে যাওয়া আটা পাওয়া যায়। পাওয়া গেলেও ধুলোমাটি মিশ্রিত; কিন্তু এটিও তাদের জন্য একটি অসাধারণ নেয়ামত হয়ে থাকে। মুহান্নাদ একবার সেখানে যখন যায় তখন সৌভাগ্যক্রমে সেখান থেকে নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীদের জন্য কিছু আটা সে পায়, সেটা নিয়ে ঘরে ফেরে। মা-ও খুশি ছিল; কয়েকজন লোকের প্রাণ রক্ষায় কাজে আসবে। কিন্তু তার পিতা তাকে ধমক দেন- দ্বিতীয়বার যাবে না। কেননা সেখান থেকে ফেরত আসাটাও মুজিযার চেয়ে কম নয়। তুমি এখনো যুবক এবং জীবনে আরো বহু কিছু করতে হবে। এজন্য এটি কোনো যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নয় যে, তুমি সেখানে কয়েক কেজি আটার জন্য চলে যাবে এবং নিজের জীবনকে হুমকির মাঝে ফেলবে। যাহোক, ৩ ডিসেম্বর আবার সে তার বন্ধুদের সাথে, দুইজন সঙ্গীর সাথে খাবারের সন্ধানে সেখানে যায়। সেখানে এক ফিলিস্তিনী ভাইয়ের লাশ দেখতে পায়। সেখানে গেলে আশেপাশের কয়েকটি রাস্তার কুকুর লাশটিকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। তারা এটাতে খুব দুঃখিত হয় এবং নিজেদের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। তারা লাশ ওঠায় এবং সেটিকে একটি এম্বুলেন্স পর্যন্ত পৌঁছায়, যেন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাফন করা যায়। সে সময় সেখানে তারা একজন আহত নারী ও তার মেয়ের আহাজারি শুনতে পায় যারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল। তারা আহতও ছিল। তারা তিনজন লাশটি অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে স্ট্রেচার নিয়ে আহত মা ও মেয়েকে আনতে ফেরত যায়। একজন আহতকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ইসরাঈলী বিমান হঠাৎ তাদের ওপর মিসাইল নিক্ষেপ করে। মুহান্নাদ, তার এক সাথি এবং দুই আহত মা ও মেয়ে ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যায়। তৃতীয় সঙ্গী বেঁচে যায়। সে এই পুরো বেদনাদায়ক ঘটনা শোনায়। সে বলে, এটি তার খুবই দুঃখ, যে ব্যক্তিই মুহান্নাদ ও তার সঙ্গীদের লাশ উঠাতে গিয়েছিল সে-ই মারা পড়েছে। শেষে তাদের লাশ গতকাল একটি হাসপাতালে পায়। একদিন পূর্বে পেয়েছে। শহীদের পিতা মুআইয়্যেদ সাহেব জামা'তের একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিনয়ী সদস্য। তিনি সর্বদা সেবার মানসে জামা'তের কাজ সন্ধানে রত থাকেন। এখানে হিউম্যানিটি ফার্স্টের একটি ক্যাম্পে নামাযের স্থানটি কাউকে পরিষ্কার করতে দেন না, বরং তা নিজেই করেন। সর্বদা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেন।

তার পিতাকেও আহমদীয়াত গ্রহণের পরে শত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। তোজোদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে ঘোষণা দিতেন– মসীহ্ এসে গেছেন। অধিকাংশ সময় তিনি এ কারণে অত্যাচারিত হয়েছেন। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনার কারণে স্থানীয় সরকার

তাকে মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হওয়ার অপবাদ আরোপ করে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত কারাবন্দি রাখে। কিন্তু তিনি সমস্ত বিপদের মাঝে অবিচল ছিলেন। তাঁর ঈমানে বিন্দুমাত্র হেরফের হয় নি।

গ্রেফতারের সময় একজন তদন্তকারী সদস্য তাঁর কানে ঘুষি মারে। এরপর থেকে তিনি সেই কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না। যাহোক, শহীদ মরহুমের পিতাও বিশাল কুরবানি করেছেন। এ পরিবার জামা'তের স্বার্থে, নিজেদের ঈমানের স্বার্থে বিরাট কুরবানি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ভবিষ্যতের সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন এবং শহীদ মরহুমের পদমর্যাদাও উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা কাদিয়ানের দরবেশ মৌলভী মুহাম্মদ আইয়ুব বাট সাহেবের, যিনি কয়েক দিন পূর্বে কাদিয়ানে একশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

আইয়ুব বাট সাহেব একবার সাক্ষাৎকারে লিখিয়েছেন যে, তাঁর মা শ্রদ্ধেয়া করীম বিবি সাহেবার মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াত এসেছিল। তিনি ছিলেন কাশ্মীরের মিরপুর নিবাসী। তাঁর এক ভাই সৈয়্যদ আরশাদ আলী সাহেব কাদিয়ান থেকে শিক্ষা লাভ করে যান। তাঁর তবলীগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর পিতাও বয়আত করেন। দরবেশ আইয়ুব বাট সাহেবের লেখা অনুযায়ী মরহুম যৌবনকালে স্বপ্নে মহানবী (সা.)-কে অশ্বারোহী অবস্থায় দেখেন। তাঁর মা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ধর্মের কাজ করার তৌফিক দান করবেন। ১৯৩৯ সালে মৌলভী সাহেব নিজের জীবন ওয়াকফ (উৎসর্গ) করেন। ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে তাঁকে ইরান যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেখানে পাঁচ বছর ধর্মের সেবায় রত থাকেন। অতঃপর আফগানিস্তানের কাবুলে যাবার আদেশ হয়। কাবুল গমনের উদ্দেশ্যে তিনি কোয়েটাতে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় আহমদীয়া জামা'ত কোয়েটার আমীর সাহেব তাঁকে বলেন, আপনাকে কাদিয়ান তলব করা হয়েছে। সময়টি ছিল দেশ-বিভাগের; ভারত-পাকিস্তান ভাগ হচ্ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হিজরত করে লাহোরে অবস্থান করছিলেন। মৌলভী সাহেব যখন লাহোরে পৌঁছেন তখন তাঁকে বলা হয়, কাদিয়ান যাবার উদ্দেশ্যে এটাই শেষ ট্রাক যাচ্ছে, এরপর হয়তো আর কোনো ট্রাক যেতে পারবে না। তাই আপনি কাদিয়ান চলে যান। কাদিয়ান পৌঁছে মৌলভী সাহেব বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তার ডিউটি দেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র ভারতে তবলীগি কার্যক্রমের অধীনে প্রেরিত মোয়াল্লেমদের সাথে তাঁকেও প্রেরণ করা হয়। তাঁকে উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে পাঠানো হয়। তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বন্ধুদের সাথেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। বর্ণনা করা হয়, একবার এক হিন্দু গুরু অসুস্থ হন। তার মুরিদ (শিষ্য) মৌলভী সাহেবকে বলে, কোনো ঔষধ দিন। তিনি বলেন, ঠিক আছে, (পরদিন) সকালে এসো। তিনি বলেন, আমি দোয়া করি। রাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে স্বপ্নে দেখি আর তিনি (রা.) তাঁর ঔষধের বাক্স খুলে বলেন, এই ঔষধটি দিয়ে দাও।

মৌলভী সাহেব মরহুম বর্ণনা করেন, আমি ভোরে যখন উঠি তখন সেই শিশিটি আমার হাতে ছিল। অতঃপর আমি সেখান থেকে তিনটি ডোজ গুরুজিকে দিয়ে দেই এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান।

হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর কর্মক্ষেত্রে থাকাকালে তিনি হোমিওপ্যাথির ডিগ্রিও লাভ করেন। তার মাধ্যমে অনেক পুণ্যবান মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করে। তার এক পুত্র ডাক্তার মাহমুদ আহমদ বাট

সাহেব ও তার স্ত্রী অর্থাৎ বাট সাহেবের পুত্রবধু ডাক্তার মঞ্জু বাট ওয়াকেফে যিন্দেগী। তিনি দীর্ঘকাল ঘানায় সেবা প্রদান করেছেন আর বর্তমানে কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে সেবা প্রদান করছেন। একইভাবে তার দ্বিতীয় পুত্রও ডাক্তার যিনি আমেরিকায় বসবাস করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর সন্তানাদি এবং বংশধরদেরও তাঁর পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুকাররম ডাক্তার মাসুদ আহমদ মালেক সাহেবের, যিনি আমেরিকা জামা'তের প্রাক্তন নায়েবে আমীর ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ছিয়াশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত আলহাজ্জ মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের প্রপৌত্র এবং মালেক আব্দুর রহমান সাহেবের পৌত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওসিয়্যতকারী ছিলেন এবং ২০০০ সালে হজ্জব্রত পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি। তিনি পাকিস্তান থেকে পড়ালেখা শেষ করে আমেরিকায় চলে যান। সেখান থেকে নেবরাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন বিষয়ে পিএইচডি করেন। এরপর বিভিন্ন স্থানে চাকরি করেন। মরহুম ২০১৩ সাল থেকে নিয়ে আমৃত্যু আমেরিকা জামা'তের নায়েবে আমীর হিসেবে জামা'তের সেবা করেন। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আমেরিকা জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে সেবা প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া বিভিন্ন জামা'তে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়াশিংটন জামা'তেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র পুস্তক Revelation Rationality Knowledge and Truth-এর জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাময়িকী থেকে উদ্ধৃতি খোঁজার জন্য তিনি নিজের টিম নিয়ে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার কাছ থেকেও কাজ নিয়েছিলেন এবং এ কাজ কয়েক বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আমেরিকা জামা'তের আমীর সাহেব লেখেন, ডাক্তার সাহেব কয়েক দশক ধরে আমেরিকা জামা'তের জন্য পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সেবা প্রদান করে আসছিলেন। খিলাফতের প্রতি পূর্ণ অনুগত ও আনুগত্যশীল আর যুগ-খলীফার ডাকে সদা সাড়া প্রদানকারী এবং জামা'তের নেযামের পূর্ণ জ্ঞান রাখতেন আর এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। তাকে সর্বদা জামা'তের নেযামের প্রতি অনুগত পেয়েছি।

তার স্ত্রী ফরিদা সাহেবা বলেন, মালেক সাহেব নিজের বেশিরভাগ সময় ধর্মের কাজে ব্যয় করার চেষ্টা করতেন। সপ্তাহে চার দিন দশ ঘণ্টা করে চাকরি করতেন যেন শুক্র, শনি এবং রবিবার নিয়মিত সারা দিন জেনারেল সেক্রেটারি দপ্তরে কাজ করতে পারেন। কর্মস্থলে দশ ঘণ্টা কাজ করার পর অনেক সময় সোজা মসজিদে চলে আসতেন। গভীর রাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি বলেন, দপ্তরে যাবার সময় একথা ভেবে নাস্তাও গাড়িতে নিয়ে যেতেন যে, (এর ফলে) সময় বাঁচবে আর জামা'তের কাজ করতে পারব।

জামা'তের সম্পদ সুরক্ষা এবং খরচাদির ক্ষেত্রেও অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতেন, বরং তিনি এক বন্ধুকে অর্থাৎ এক কর্মচারীকে বলেন, জামা'তে স্বাচ্ছন্দ্য এসে গেছে ঠিকই, কিন্তু যে সাবধানতার সাথে খরচ করা উচিত, অনেক মানুষ সেভাবে করে না, অপ্রয়োজনীয় খরচ করে। পুরনো লোকদের এ নিয়ে গভীর দুঃখ হয় যে, জামা'তী অর্থ

যেভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত অনেক সময় সেভাবে ব্যবহৃত হয় না। এ বিষয়ের প্রতিও সকল কর্মকর্তার দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

তাঁর মেয়ে সারা বলেন, মরহুমকে সর্বক্ষণ জামা'তের সেবায় ব্যস্ত দেখেছি। ঘরে তিনি তাঁর টেবিলের সামনে বড়ো একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছিলেন যাতে লেখা ছিল, What have I done today in the service of my Jama'at? আর মরহুম সত্যিই প্রতিদিন জামা'তের সেবায় ব্যস্ত থেকেছেন। তাঁর ভাই মালেক মুবারক সাহেব বলেন, বায়তুর রহমান-এর নির্মাণ সম্পন্ন হবার পর প্রতিদিন কর্মস্থল থেকে সোজা মসজিদে আসতেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বিশেষ করে মজলিসে শূরার দিনগুলোতে তাঁর দায়িত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত। বেশ কয়েক সপ্তাহ দীর্ঘসময় জামা'তের কাজে ব্যয় করতেন।

তাকে চেনেন এমন অনেক মানুষ লিখেছেন, জামা'তের নেযামের প্রতি তাঁর হৃদয়ে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান নিহিত ছিল। নিজের সন্তানদের মাঝেও জামা'তের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। নিজেও তাকওয়ার (খোদাভীতি) পথে পদচারণা করতেন এবং নিজ সন্তানদেরও এর উপদেশ প্রদান করতেন। নিকটাত্মীয় এবং দূরের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা তাঁর বড়ো এক গুণ ছিল। অভাবীদের সর্বদা সাহায্য করতেন এবং অসুস্থদের সর্বপ্রথম দেখতে যেতেন। অত্যন্ত বিনয়ী, অতিথিপরায়ণ, জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। প্রতিটি কাজ বিস্তারিত খুঁটিনাটি সামনে রেখে সম্পাদন করতেন। নিজ দায়িত্ব বুঝে পালন করতেন। মসজিদে বেশি বেশি সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, পদমর্যাদায় উন্নীত করুন। তাঁর সন্তানসন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও তাঁর পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুকাররম শাব্বির আহমদ লোধী সাহেবের, যিনি মরহুম মিয়া মুহাম্মদ শাফী সাহেবের পুত্র এবং আমাদের এক মুরব্বী সিলসিলাহ ফাররুখ শাব্বির লোধী সাহেবের পিতা ছিলেন। সম্প্রতি বাষট্টি বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাঁর বংশে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন তাঁর দাদা নাঙ্গাল নিবাসী মিয়া শিহাবুদ্দীন সাহেব লোধীর মাধ্যমে হয়। খিলাফতে সানীয়ার প্রাথমিক যুগে বয়আত করে তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। মরহুম মূসী ছিলেন। বড়ো পুত্র ফাররুখ শাব্বির লোধী মুবাল্লেগ সিলসিলাহ হিসেবে লাইবেরিয়ায় আছেন। বিগত কয়েক বছর যাবৎ তিনি সেখানে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন এবং কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করার কারণে নিজের পিতার জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। ফাররুখ শাব্বির লোধী সাহেব তাঁর পিতা সম্পর্কে লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তাহাজ্জুদ আদায়কারী, পাঁচবেলা নামায আদায়কারী, যথাসম্ভব বাজামা'ত নামায আদায়কারী, ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দানকারী, কুরআন তিলাওয়াতকারী, জামা'তের বইপুস্তক অধ্যয়নকারী এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। নিয়মিত খুতবা শুনতেন। তাহরীকসমূহে লাব্বাইক বলে (অংশগ্রহণ করতেন)। সুস্থ অবস্থায় নফল রোযা নিয়মিত পালনকারী, সর্বদা জামা'তের সেবায় প্রস্তুত, ওয়াকেফে যিন্দেগীদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা পোষণকারী, কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জামা'তের নেযামের প্রতি আত্মাভিমানী, ভালোবাসার সাথে তরবিয়তকারী, মার্জনাশীল, বিপদাপদে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রদর্শনকারী, নিজ সমস্যাবলি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আহাজারি করে উপস্থাপনকারী,

অন্যের বিপদে সর্বাত্মক সাহায্যকারী, কারো বিরুদ্ধেই হৃদয়ে অসন্তুষ্টির মনোভাব রাখতেন না, কোনো সফলতা লাভ করলে সেটিকে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা বলে আখ্যাদানকারী, ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভুল মতামতদাতা, অতিথিপরায়ণ, মুক্ত হস্তে সাহায্য দানকারী ছিলেন। নিজ অধীনস্তদের সাথে উত্তম আচরণকারী ছিলেন। শুধু তাঁর পুত্রের কথাই নয় বরং অন্যরাও তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি একজন পুণ্যবান ভালো মানুষ ছিলেন।

গুজরানওয়ালায় এক যুগে যখন কলেমা মুছে দেবার আন্দোলন শুরু হয় অর্থাৎ তখন আমাদের মসজিদ থেকে কলেমা মুছে ফেলা হতো, তখন তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল; [(তার পুত্র) লিখেছেন,] প্রত্যেকবার যখন কলেমা মুছে ফেলা হতো তখন তিনি দ্রুত গিয়ে পুনরায় কলেমা লিখে দিতেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি সে সময় কাজ করেছেন। তিনি লেখেন, তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কারো পক্ষ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও কখনো এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন না, বরং ধৈর্য-স্থৈর্য প্রদর্শন করতেন আর বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অর্পণ করতেন। নিজের দোয়া দ্বারা নিজ ব্যথা দূর করার লড়াই করতেন।

যে স্কুলে তিনি পড়াতেন সেখানে সহকর্মীরা প্রচুর বিরোধিতা করেছিল, এমনকি একজন ছাত্রকে কতক সহকর্মী বলেছিল যে, তাকে গুলি করো, আমরা তোমাকে পুরস্কৃত করব। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সর্বদা নিরাপদে রেখেছিলেন এবং সেখানে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাজ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তার সন্তানদেরও হাফেয ও নাসের হোন। নামাযের পর আমি জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)